ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়েও আমরা স্বপ্ন দেখি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। যে বাংলাদেশে স্থান হবে না রাজাকার আল-বদরের। আবার জেগে উঠবে বাংলাদেশ... ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আল-বদরের তাসের সিংহাসন... যেভাবে ভেঙেছিল একাত্তরে। প্রতিপক্ষতো সেই একই... এই ডিসেম্বরে কেন ভীত-সন্ত্রস্ত হব বিজয়ীরা... বাঙালিতো প্রতিকূলের যাত্রী, ধ্বংস স্তূপে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখি, বলি...

এও লালোবাসি বাংলাদেশ

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

ডিসেম্বর। বিজয়ের মাস। বাংলার বিজয় উৎসব, বাঙালির বিজয় উৎসব। দীর্ঘ ২৪ বছরে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি পেয়েছিল নিজের দেশ, বাঙালির দেশ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের বিজয়কে। দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয় বিজয় উৎসব। অনুষ্ঠিত হয় বিজয় মেলা। গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত তার বিস্তৃতি।

স্বাধীনতার বয়স বাড়বে, ক্রমেই মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ, এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। এই প্রত্যাশার স্বপ্ন বুকে ধারণ করেই ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি। স্বাধীন করেছিল তার স্বপ্নভূমি- বাংলাদেশ। পরাজিত হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর তাদের সহযোগী আল-বদর, রাজাকার...।

আজ পঁয়ত্রিশ বছর পরে এসে হুমকির মুখে বাঙালি জাতি, বাংলাদেশ। রক্ত দিয়ে যে বাংলাদেশ অর্জন করেছে, সেই বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে পথ চলা যাবে না। বোমা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে একটি বিজয়ী জাতির! জনগণের ভোটে ক্ষমতায় যাওয়া তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রেমীরা হবে রাজাকার, আল-বদরদের সহযোগী!!

কথা ছিল না এমনটা হওয়ার। তারপরও হয়েছে, হচ্ছে। ব্যর্থ, অসৎ, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা সেটা করছে।

যশোর থেকে নেত্রকোনা- মৌলবাদের ভয়ঙ্কর তান্ডব। এরা নাকি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছে। একাত্তরে এভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল জামায়াতে ইসলামী। রাজাকার, আল-বদররা রেকর্ড করেছিল বর্বরতার। জবাব দিয়েছিল বাংলার মানুষ। সামরিক-রাজনীতিকরা জামায়াতরূপী প্রাণীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। তেলাপোকার মতো তারা পুনর্বাসিত হয়েছে। একাত্তরের হত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারীরা আল্লাহ'র আইন এবং সৎ লোকের শাসন চায়! বোঝা যায় এখন তারা আগের চেয়ে অনেক কৌশলী। ইতিহাস থেকে তারা শিখেছে।

বাংলাদেশে এখন বোমা হামলা চলছে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই জামায়াতের- এমনটাই তারা বলতে চাইছে। নাম আসছে 'জামাআতুল মুজাহিদিন', 'জাগ্রত মুসলিম জনতার'...। তাদের স্লোগান আল্লাহর আইন, সৎলোকের শাসন...। জামায়াতের স্থানীয় নেতারা তাদের আশ্রয়দাতা। রাজশাহী, হবিগঞ্জে এমন কিছু জঙ্গি গ্রেপ্তারও হয়েছে। তার আগে বাংলা ভাইদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চেয়েছে নিজামীরা...। সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দুলুরাও আছে। আছে রাষ্ট্রযন্ত্র। আহলে হাদিস নামধারী জঙ্গি গালিবের ঘনিষ্ঠজন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি।

কী প্রমাণ করে এই তথ্যগুলো? প্রমাণ করে একাত্তরের মতোই দুঃসময় এখন বাংলাদেশের কপালে। এও প্রমাণ করে একাত্তরের পরাজিত রাজাকার, আল-বদর আর জেএমবি আহলে হাদিস- একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ঘাতক জামায়াত-শিবিরই জেএমবি। জেএমবিই জামায়াত...। তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। বিজয়ী বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেয়া...।

বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার আগেই ৯ ডিসেম্বর মুক্ত হয়েছিল নেত্রকোনা।

নেত্রকোনা দখলমুক্ত হওয়ার সেই আনন্দ-উৎসবের দিনটি এবার সেখানকার মানুষ পালন করেছে জঙ্গিবাদী বোমা হামলায় নিহতদের জন্য মাতম করে। শোক র‍্যালি করে। বিজয় উৎসবের আনন্দ-উৎসবের প্রতিটি দিনেই এখন খবর আসছে নেত্রকোনায় ইসলামী জঙ্গিবাদী বোমা হামলায় আহতদের মৃত্যুর। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের মুহূর্তে মানুষ যেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে, মিরপুরের শিয়ালবাড়ীতে বুদ্ধিজীবীদের বিকৃত লাশ দেখে, তেমনি টেলিভিশন-রেডিওতে এসব মৃত্যুর খবর শুনে মানুষ শিউরে উঠছে। মানুষের বুকের ঘৃণার আগুন এখন প্রতিদিন জ্বলন্ত আগুন হয়ে তেতে উঠছে বারবার।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের প্রাক-মুহূর্তে আঘাত হেনেছিল ধর্মের আবরণ পরা ঘাতক গোষ্ঠী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তারা সমর্থন জুগিয়েছে, সহায়তা করেছে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগকে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যখন দ্বারপ্রান্তে তখন অপেক্ষা করেছে কখন মার্কিন সৈন্যরা এসে নামবে বাংলাদেশে তাদের সমর্থনে। ইসলামের পবিত্র বদর যুদ্ধের নামে গঠন করেছে আল-বদর বাহিনী। কিন্তু তাদের ঐ ধর্মের আবরণ ভেদ করে অচিরেই বেরিয়ে এসেছে ঘাতক চেহারাটি। ধর্মের ঐ ছদ্মাবরণে তারা বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এবারও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার নামে যে জঙ্গি ও আত্মঘাতী বোমা হামলা চলছে তারও লক্ষ্য বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট, নির্বাচনসহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তার মূল দিকসমূহ।

২.

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গি ও আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী এই গোষ্ঠী তাদের ঐ বোমা হামলার পাশাপাশি ঘোষণা দিয়েছে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসব পালন না করার জন্য। ঢাকার স্কুলে স্কুলে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন ইসলামী গোষ্ঠীর নামে। বরিশালে জেএমবি'র নামে দেয়া চিঠিতে সংস্কৃতি সমন্বয় পরিষদকে বিজয় উৎসব পালন না করার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে। জামাআতুল মুজাহিদিন বলেছে, তারা বোমা মেরে সাভার স্মৃতিসৌধ উড়িয়ে দেবে। বিজয় উৎসব পালন না করার জন্যও হুমকি দিয়েছে তারা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে বিজয় উৎসব পালন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও, বিভিন্ন স্থানের প্রশাসন এই উৎসব পালন করার ব্যাপারে কোনো প্রকার নিরাপত্তা প্রদানে

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গি ও আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী এই গোষ্ঠী তাদের ঐ বোমা হামলার পাশাপাশি ঘোষণা দিয়েছে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসব পালন না করার জন্য। ঢাকার স্কুলে স্কুলে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন ইসলামী গোষ্ঠীর নামে। বরিশালে জেএমবি'র নামে দেয়া চিঠিতে সংস্কৃতি সমন্বয় পরিষদকে বিজয় উৎসব পালন না করার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে

অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ কারণে ইতিমধ্যে মানিকগঞ্জে প্রতিবছর ধরে পালিত বিজয়মেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে আশুগঞ্জের মেলা। জেলা ও উপজেলায় যেসব বিজয়মেলা হতো সেসবও বন্ধ। অনেক জেলাতেই বিজয় দিবসের কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে না। একমাত্র চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিজয়মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ঘোষণা দিয়েছে যে, সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলেও তারা বিজয় উৎসবের যে কর্মসূচি নিয়মিত পালন করে তা অব্যাহত রাখবে। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি ও সংস্কৃতিকর্মীদের মতে, জনজমায়েতের প্রতিরোধে জঙ্গিবাদী শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। একাত্তরের মতো এবারও রুখে দাঁড়াতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

৩.

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর ভুল রাজনীতি 'ক্ষমা করা'র মধ্য দিয়ে জামায়াতিদের পুনর্বাসনের সূচনা হয়। নিজেদের গুছিয়ে নিতে থাকে তারা। শুরু করে বাংলাদেশ বিরোধী গোপন তৎপরতা। সাবেক রাষ্ট্রপতি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান দেশবিরোধীদের দেন রাজনৈতিক শেল্টার।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজয় উৎসব- এসবের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলছিল তা প্রকাশ্য রূপ নেয়। সামরিক আইন উপ-প্রশাসক এয়ার মার্শাল তোয়াবের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত 'সিরাতুন্নবী মাহফিল' থেকে প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয় ঐ ধর্মবাদী জেহাদি আহ্বান। ঢাকায় পিজিতে রোগশয্যায় শায়িত মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী সে সময় বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা পুনরুদ্ধারের ঐ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলে সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া তার ঐ উপ-সামরিক আইন প্রশাসককে নিবৃত্ত করতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত তোয়াব দেশও ত্যাগ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে পাল্টে দিতে ষড়যন্ত্রের অবসান হয়নি। বরং একাত্তরে যে ধর্মবাদী রাজনীতিকে পরাস্ত করা হয়েছিল সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ওই শক্তির পক্ষ হয়ে তাকে সংবিধান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন ঘটান। পুনর্বাসন ঘটে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলো। সংবিধানের মূল নীতিতে যেমন ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান ঘটিয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'কে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তেমনি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। আল্লাহর আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করার যে দাবি ইসলামী জঙ্গিরা সম্প্রতি উচ্চারণ করছে, তা ঐ সংবিধান সংশোধনীতেই নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জামায়াতে ইসলামী যে অংশীদারিত্ব করছে তারও সূত্রপাত সেখানেই।

আল-বদর বাহিনী প্রধান বর্তমান জামায়াতের আমির ও শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী যে ইসলামী ছাত্রসংঘের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান ছিল তারই পরিবর্তিত রূপ দেয়া হয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের নামে ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই শিবিরে নানা উপায়ে দেশের মেধাবী ছাত্রদের সংগঠিত করার পাশাপাশি সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয় শিবিরের ঘাতক বাহিনী। হেকমতিয়া বাহিনী, কেরামতিয়া বাহিনী, সিরাজুস সালেহীন নামের এসব সংগঠনকে প্রথমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সংগঠিত করা হলেও এদের নেতৃত্বে শিবিরের সাধারণ ছাত্রদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল-হোস্টেল দখল করার জন্য শুরু করা হয় রগ কাটা, চোখ তোলা, হাত কাটা, গান পাউডার ছিটিয়ে প্রগতিশীল ছাত্রদের মাংস জ্বালিয়ে দেয়ার রাজনীতি।

জিয়া ও এরশাদের শাসনকাল জুড়ে ইসলামী ছাত্রশিবির দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই তাণ্ডব চালিয়ে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ওপর বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে তারা এই দখলদারিত্ব মোটামুটি সম্পন্ন করে। মাঝখানের সময়টা যখন শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল তখনও জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা শেল্টার পেয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে না হলেও আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা জামায়াত-শিবিরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। ইসলামী জঙ্গিদের যারা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তাদের শতকরা ৪১%-ই এই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সক্রিয় কর্মী অথবা ক্যাডার।

জামাআতুল মুজাহিদিন, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী, হরকাতুল জিহাদ, শাহাদাতুল হিকমা নামের যেসব ইসলামী জঙ্গি সংগঠন সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তার নেতারা কোনো না কোনো সময় জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। শায়খ আব্দুর রহমান, নিজামীর নেতৃত্বাধীন আল-বদর বাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার ছিলো। তার বাবা নিজেও কুখ্যাত রাজাকার ছিল এবং নিজ এলাকা থেকে পালিয়ে রাজশাহীর একটি মসজিদে তার মৃত্যু হয়। সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে 'বাংলা ভাই' শিবিরের ক্যাডার ছিলো। মুফতি হান্নান, মাওলানা গালিব সবাই কোনো না কোনোভাবে জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসে এসব ব্যক্তি বাংলাদেশে যে ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে তাকে রাজনৈতিক ছত্রছায়া প্রদান করে জামায়াতে ইসলামী ও আমিনী-শায়খুল হাদিসদের সংগঠন।

৪.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী তাদের একাত্তরের সশস্ত্র সংগঠনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে তারা মূলত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বেছে নেয়। এই অঞ্চলে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের সামরিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উখিয়া ও নাইক্ষ্যংছড়িতে যেসব সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প তারা পরিচালনা করত সেসব স্থান থেকেই এখন নিরাপত্তা বাহিনী বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করছে। জানা যায়, এসব ক্যাম্প পরিচালনায় তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তিবাহিনী দমনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিশেষ সহায়তা লাভ করে। এই সেনাবাহিনীর সহায়তায়ই জামায়াতে ইসলামী পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসী বাঙালিদের মধ্যে তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত এসব প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও তার ট্রেনিংপ্রাপ্তদের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এসব ক্যাম্পের মাধ্যমে জামায়াত চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ডেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আন্ডারওয়ার্ল্ডেও জঙ্গি সরবরাহ করছে। গড়ে উঠেছে মৌলবাদী চক্রের ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি এক কালো অর্থনীতি।

ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশের তালেবানি শাসনের প্রবক্তা। জামায়াতে ইসলামের রাজনৈতিক মেধা, ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ইসলামী নামের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ইসলামী জঙ্গিদের মূল সমর্থন প্রদান করলেও, এর লোকবল মূলত সংগৃহীত হচ্ছে কওমি মাদ্রাসাসমূহ থেকে। এ কারণেই খতিব ওবায়দুল হক, মুফতি আমিনী, শায়খুল হাদিসসহ ইসলামী ঐক্যজোটের নেতারা জঙ্গি কর্মকান্ডকে ইসলামবিরোধী ও আত্মঘাতী বোমা হামলাকে 'দোজখি মহাপাপ' বলে অভিহিত করলেও, কওমি মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসা পুলিশি তল্লাশির ঘোর বিরোধিতা করছে এবং ধর্মযুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তারা প্রকাশ্যেই অবস্থান নিয়েছে।

খতিব ওবায়দুল হক, মুফতি আমিনী, শায়খুল হাদিসসহ ইসলামী ঐক্যজোটের নেতারা জঙ্গি কর্মকান্ডকে ইসলামবিরোধী ও আত্মঘাতী বোমা হামলাকে 'দোজখি মহাপাপ' বলে অভিহিত করলেও, কওমি মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসা পুলিশি তল্লাশির ঘোর বিরোধিতা করছে এবং ধর্মযুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তারা প্রকাশ্যেই অবস্থান নিয়েছে

৫.

বিজয় দিবসকে সামনে রেখে ইসলামী জঙ্গিদের আক্রমণ মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তির প্রতিশোধ অভিযান। বিজয় দিবসের উৎসব ভন্ডুল করে দিয়ে তারা জনগণের মধ্যে পরাজয়ের ধারণা সৃষ্টি করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক তাই তাদের লক্ষ্য। ক্ষমতাসীন বিএনপি জামায়াত-শিবির-ঐক্যজোটের সেই পরাজিত শক্তিকেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করে রেখেছে। এটা ঠিক যে, বিজয় দিবসের সূর্যোদয়কালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সাভার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দেবেন। তাদের সঙ্গে থাকবে একাত্তরের সেই বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে ঘাতকের খঞ্জর চালিয়ে যারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল সেই ঘাতক আলবদর বাহিনীর প্রধান নিজামী। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে যে ইসলামিক এনজিওসমূহ ইসলামী জঙ্গিদের অর্থায়ন করছে সেই এনজিওদের নিয়ন্ত্রক সমাজকল্যাণমন্ত্রী মুজাহিদী। ইসলামী জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী-এমপিরাও তাদের সঙ্গে থাকবেন। নিরাপত্তার বেড়াজালে সংকুচিত হবে বিজয় দিবস। যে বাংলাদেশের মানুষ ১৬ ডিসেম্বরের প্রাক্কালে মুক্তিযোদ্ধার গুলি-বিস্ফোরকের শব্দে আশ্বস্ত বোধ করতেন, দেশ স্বাধীন স্বপ্নসাধ পূরণ হচ্ছে এই আশায় এখন তারা আতঙ্কিত সেই বিজয় ছিনিয়ে নিতে গত পঁয়ত্রিশ বছরে যে চক্রান্ত বাস্তবায়নের নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেটাই ইসলামী জঙ্গিবাদের নতুন চেহারায় কার্যকর হবে কিনা। ২০০৫-এর বিজয় দিবসে তাই কেউ আর আনন্দ-উৎসবে ভাসতে পারছে না। এই বাস্তবতায় বিজয় উৎসব পালন হবে ঠিকই। তবে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায়। তার বাস্তব পদক্ষেপে। বাংলার মানুষ গলা পানিতে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে সুন্দর আগামীর। স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটাই তার জীবন। বিপদ আসবে, আসবে ভয়, শঙ্কা- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মেই আবার মানুষ এর থেকে মুক্তও হয়। এর জন্য সময় লাগে। কখনো পাঁচ বছর, কখনো পঁচিশ বছর বা একশ' বছর... একটি জাতির যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে তার টিকে থাকা, তার বেড়ে ওঠা। বাঙালি জাতি হিসেবে যোগ্যতার প্রমাণ সে দিয়েছে বারবার। বাংলাদেশের মানুষ তিন যুগ ধরে প্রমাণ করছে প্রাকৃতিক, মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা এগিয়ে যেতে সক্ষম। আগামীতেও দেবে নিশ্চয়ই। আমরা চাই আগামীর প্রত্যাশায়...।